মূলপাতা

গোঁড়ায় গলদ

Asif Adnan

January 25, 2022

12 MIN READ

নিউটনের গতিসূত্রগুলো মনে আছে? আর কিছু মনে না থাকলেও তৃতীয় সূত্রটা নিশ্চয় মনে থাকার কথা,

> ‘সকল ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে’।

আচ্ছা বলুন তো, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র আর অর্থনীতির চাহিদা ও জোগানের সূত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

প্রশ্নটা অস্পষ্ট, ঠিক জুতসই হলো না। অনেক ধরনের, অনেক পার্থক্যই তো আছে! আসলে আমি একটা নির্দিষ্ট দিকের কথা জানতে চাচ্ছি। প্রশ্নটা অন্যভাবে করা যাক।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র যেভাবে সঠিক, যে মাত্রায় সঠিক, অর্থনীতি, পলিটিকাল সাইন্স, সমাজতত্ত্ব কিংবা মনোবিজ্ঞানের সূত্র কিংবা উপসংহারগুলো কি একইভাবে, একই মাত্রায় সঠিক?

প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্ন এবং এর উত্তর কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমা সভ্যতা দাবি করে বিজ্ঞানের মতোই সামাজিক বিজ্ঞানগুলোও তথ্য এবং যুক্তির ওপর দাঁড়ানো। অর্থাৎ নিউটনের গতিসূত্র যেমন সত্য, ঠিক তেমনিভাবে চাহিদাজোগান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সমাজতত্ত্বের মৌলিক সূত্রগুলোও ঠিক। তারচেয়ে বড় কথা হলো, ক্যালকুলাস কিংবা জ্যামিতির মতো সামাজিক বিজ্ঞানগুলোও নিরপেক্ষ।

ক্যালকুলাস, জ্যামিতি কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র যেমন যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় প্রযোজ্য, তেমনিভাবে প্রযোজ্য সামাজিক বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সূত্রগুলো। এগুলোর পেছনে কোনো আদর্শ বা মতামত নেই। কেবল নিরেট তথ্য-উপাত্ত, বাস্তবতা আর যুক্তি। জাস্ট প্লেইন ফ্যাক্টস।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলো পযিটিভ। নরম্যাটিভ না।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেক্যুলার দর্শনের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো তৈরি হয়েছে পশ্চিমের এক নিজস্ব দর্শন ও ধ্যানধারণাকে ঘিরে। এবং এ শাস্ত্রগুলো কাজ করে সেক্যুলার মূল্যবোধ ও সমাজ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে। নৈতিকতার নিজস্ব ধ্যানধারণার ওপর দাঁড়ানো এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো তাই নিশ্চিতভাবেই সাবজেক্টিভ, যদিও পশ্চিমা বিশ্ব এগুলোকে সন্দেহাতীত সত্য বলে দাবি করতে চায়।

দুঃখজনকভাবে, মোটাদাগে আমরা মুসলিমরা তাদের এ দাবি মেনে নিয়েছি। এ দাবি মেনে নেয়ার কারণে সত্যিকারের বিকল্প খোঁজার বদলে আমরা মনোযোগী হয়েছি পশ্চিমা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামীকরণে। সত্যিকার অর্থে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকগুলোর একটি হলো, ভুল দাবি থেকে জন্ম নেয়া ইসলামীকরণের এ ভুল পদ্ধতি। সেক্যুলার সামাজিক বিজ্ঞান আর ইসলাম একই ধরনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির উদ্দেশ্যে কাজ করে না। বরং এসব বিষয়ে তাদের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীতমুখী। পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ভিত্তি হলো এমন কিছু সেক্যুলার মূলনীতি ও পূর্বধারণা যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আশির দশকে শুরু হওয়া ‘জ্ঞানের ইসলামীকরণ’ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চেহারা দেয়া। পাশাপাশি শুরু হয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের ইসলামীকরণ।

ইসলামীকরণের এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও ব্যবস্থা নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়। ফলে সত্যিকারের ইসলামী বিকল্প গড়ে তোলার বদলে বিদ্যমান পশ্চিমা কাঠামোর মধ্যে ইসলামকে খাপ খাওয়াতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ দিকেই ব্যয় করতে শুরু করি আমাদের সব সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা।

গত দুই শ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতা অভাবনীয় উন্নতি করেছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। গাড়ি, ট্রেইন, এরোপ্লেইন, ফ্রিজ, রকেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন–এ উন্নতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। প্রযুক্তিগত এ উন্নতি আমাদের জীবনকেও বদলে দিয়েছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানের চোখধাঁধানো এ সাফল্যের কারণে আমাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে একই রকম সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্বের চোখে দেখে।

কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনা সংখ্যা আর অঙ্ক নিয়ে না, মানুষ আর সমাজকে নিয়ে। স্রষ্টা, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বজনীন নৈতিকতার ব্যাপারে পশ্চিমা অস্বীকৃতি সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ক্ষেত্রে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন ভুল ধারণার।

একদিকে দুনিয়াবি বিষয়ে গভীর বুঝ আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা ও মানুষকে বোঝার ক্ষেত্রে অন্ধত্বের এ মিশ্রণ নতুন না। মক্কায় আবু জাহল পরিচিত ছিল আবুল হাকাম নামে। আল-মাসীহ আদ-দাজ্জাল দুহাত ভরে দুনিয়ার প্রাচুর্য নিয়ে এসে নিজেকে রব দাবি করবে, আর অধিকাংশ তাকে মেনেও নেবে।

আল সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেন :

> “যখন তাদেরকে বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে তাদের মতো তোমরাও ঈমান আনো। তারা বলে, ‘নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব?’ আসলে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।”
>
> *সূরা আল-বাক্বারা, ১৩*

দুনিয়াবি আর বৈষয়িক ব্যাপারগুলোতে যাদের ‘বুদ্ধিমান’ মনে করা হয়, সাধারণ মানুষের মতো সরলভাবে বিশ্বাস করা তাদের অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যায়। বিনা প্রশ্নে সত্যকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকতা অনেকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনটাই হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষেত্রে। অভাবনীয় প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষ ও মানবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে পশ্চিমের হয়েছে অভাবনীয় অবনতিও।

পশ্চিমা বিজ্ঞানের সাফল্যের যেমন অনেক প্রমাণ আছে তেমনি প্রমাণ আছে তাদের সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যর্থতার। বেশ কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা সমাজ মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান ও মৌলিক ইউনিট পরিবার। বাড়ছে ডিভোর্স, পরকীয়া আর জারজ সন্তান। প্রতিবছর বৈধভাবে হত্যা করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ গর্ভের শিশুকে। চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে মাদকাসক্তি। পর্ন প্রভাবিত সিনেমা আর মিউযিক ইন্ড্রাস্টি যৌনতার বিকৃত ধারণা ঢুকিয়ে চলেছে সমাজে। সমকামিতা এবং ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মতো বিকৃতিকে শুধু বৈধতাই দেয়া হচ্ছে না; বরং রীতিমতো উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ঘুণে খাওয়া সমাজ, ভাঙা পরিবার আর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব পড়ছে সন্তানদের মনস্তত্ত্ব, পড়াশোনা ও আর্থিক জীবনে। পরিবার থেকে সমাজ ও জীবনের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখার বদলে দশকের পর দশক ধরে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর বেড়ে উঠছে গভীর মানবীয় বন্ধন স্থাপনে অক্ষম হয়ে–হতাশা, ক্ষোভ, মাদকাসক্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে।

অন্যদিকে ‘সার্বভৌমত্ব বজার রাখার অর্থ অন্যের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা’ এ নীতিতে বিশ্বাসী যুদ্ধবাজ অ্যামেরিকা আর জাতিসংঘের ‘শান্তি প্রতিষ্ঠার’ কর্মকাণ্ড সংকেত দিচ্ছে জঙ্গলের আইনে ফিরে যাবার। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে পশ্চিমা বিশ্ব খুঁজে বের করেছে নির্যাতনের বৈজ্ঞানিক সব পদ্ধতি। ম্যাস ভায়োলেন্স, গণহত্যা এবং সমাজ ও মূল্যবোধের ভাঙনের পেছনে আধুনিকতার প্রভাব ও সম্পর্কের বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণায়।

অনেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখেন। বারবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের অংশগ্রহণ ও উন্নতির ওপর জোর দেয়ার কারণ কী? কারণ, জ্ঞানের এ শাখাগুলোর সাফল্য, উন্নতি ও ফলাফল স্পষ্ট। একই যুক্তিতে আমাদের উচিত পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যাপারে সতর্কহওয়া । কারণ, এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো বয়ে এনেছে ভয়ংকর সব ফলাফল, আজকের পতনোন্মুখ পশ্চিমা সমাজের চিত্র থেকে যা স্পষ্ট। বিস্ময়কর মাত্রার বস্তুগত ও জাগতিক উন্নতি সত্ত্বেও এসব সমাজের মানুষগুলো আজ জীবন কাটাচ্ছে প্রগাঢ় হতাশা, আর বিষণ্নতায়। সাময়িক সস্তা সুখের উত্তেজনাকে ছাপিয়ে আজ তাদের গ্রাস করে নিয়েছে অর্থহীন অস্তিত্ব আর গন্তব্যহীনতার অনুভূতি।

বিজ্ঞান আর সামাজিক বিজ্ঞানের পার্থক্য

সামাজিক তত্ত্ব আর দর্শনগুলো শুধু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না; বরং বাস্তবতা দ্বারাও অসমর্থিত। তবু কেন আমরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হলাম?

এ প্রশ্নের এক লাইনের কোনো উত্তর নেই। এর পেছনে আছে বিভিন্ন ফ্যাক্টর। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইসলামী আলিম ও চিন্তাবিদদের লেখায় পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। পরে একপর্যায়ে দেখা দেয় মুসলিম বিশ্বে রেখে যাওয়া ঔপনিবেশিক ইউরোপিয়ানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করে, কোন কোন দর্শনের ভিত্তিতে এবং কীভাবে এগুলোর সংস্কার সম্ভব, তা বোঝার জন্য পশ্চিমা শিক্ষা অর্জন করা দরকার ছিল।

কিন্তু পশ্চিমা শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে মুসলিমদের অনেকেই নিজস্ব জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাপারে পশ্চিমের অনেক মিথ্যা দাবিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

এমনই এক মিথ্যা দাবি হলো, পশ্চিমা বিজ্ঞান আর সামাজিক বিজ্ঞান একই রকম সত্য–দুটোর ভিত্তিই হলো নিরেট তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি।

অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র আর চাহিদা-জোগানের সূত্র একই রকম, একই মাত্রায় সঠিক। এ মিথ্যা দাবিকে মেনে নেয়ার ফলে মুসলিমরা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে সঠিক হিসেবে ধরে নেয় এবং ইসলামের আলোকে এ দাবিগুলোর মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র কি ইসলামী? এ সূত্রের কি ইসলামী হবার দরকার আছে? আদৌ কি দরকার আছে এ নিয়ে চিন্তা করার?

যদি চাহিদা-জোগানের সূত্রও তৃতীয় গতিসূত্রের মতো হয়, তাহলে সেটা নিয়েও নিশ্চয় চিন্তা করার দরকার নেই?

তাই না?

নিতান্ত বোকা ছাড়া আর কেউ কি গাড়ি, বিমান কিংবা অন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করবে, কারণ এগুলো সুন্নাহসম্মত না এবং এগুলো আমাদের শত্রু পশ্চিমাদের বানানো?

নিশ্চয় না।

কিন্তু সমস্যা হলো এ কথা পশ্চিমাদের তৈরি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে খাটলেও তাদের তৈরি সামাজিক বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে খাটে না। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র আর সামাজিক বিজ্ঞানের সূত্র এক না।

নিউটনের গতিসূত্রগুলো যেভাবে সঠিক ও নিরপেক্ষ, অর্থনীতির সূত্রগুলো তেমনটা না।

কিন্তু আমরা ধরে নিলাম, যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রযোজ্য সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। আর এভাবে একসময়, হয়তো নিজেদের অজান্তেই, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিক ক্রমধারায় আমরা পশ্চিমা রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকরী হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম।

আমরা এ উপসংহারে পৌঁছালাম যে, ইলেক্ট্রিসিটি কিংবা গাড়ির মতোই ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, স্টক মার্কেট, সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতিরাষ্ট্র এবং গণতন্ত্রও আধুনিক বিশ্বে অপরিহার্য। এবং ধরে নিলাম মুসলিমদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের উপায় হলো এসব প্রতিষ্ঠানের ইসলামীকরণ।

পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের শেকড়

অনেক অমিল সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর দিকে মুসলিম ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। দুই সমাজের চিন্তা আবর্তিত হতো ধর্মকে কেন্দ্র করে। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো ধর্মের আলোকে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এ অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন এক বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উত্থান ঘটে সেক্যুলার চিন্তার, যা সীমাবদ্ধ করে ফেলে ধর্ম ও ধর্মের প্রভাবকে। ঠিক কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে, পর্যায়ক্রমে সেক্যুলারিযমের জন্ম ও ও উত্থান ঘটেছিল তা বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ কাজটা করতে গিয়ে আমাদের মুখোমুখি হতে হয় বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার। যেসব উৎস ও আলোচনাকে বর্তমানে পশ্চিমের 'মূলধারা' ধরা হয় সেখানে আপনি এ আলোচনাগুলো খুঁজে পাবেন না। এ বিষয়ে ইউরোপীয় নিজস্ব বয়ানের অধিকাংশই ইতিহাসের এমন এক ছবি তুলে ধরে যা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক এবং মৌলিকভাবে ভুল। এসব ভুল উত্তরের মাঝ থেকে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন।

বাস্তবতা হলো ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর আবির্ভাব ঘটে ধর্মের বিকল্প হিসেবে। সামাজিক বিজ্ঞান মানুষ ও সমাজের ব্যাপারে মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসের বদলে যুক্তি, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের আলোকে দিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ সেক্যুলারিযম এবং পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভবই হয়েছে ধর্মের বিকল্প হিসেবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার জন্যে। আর তাই সহজাতভাবেই এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলো সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য করা কিংবা এগুলোর ইসলামীকরণ বেশ কঠিন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার সেক্যুলারায়নকে আধুনিক পশ্চিম কীভাবে উপস্থাপন করে? ধর্মের জায়গায় সেক্যুলার দর্শন বসানোকে উপস্থাপন করা হয় কুসংস্কারের ওপর যুক্তির বিজয় হিসেবে। এখানে যুক্তি মানে 'বিজ্ঞান' আর কুসংস্কার হলো ক্রিশ্চিয়ানিটি বা ধর্ম। ইতিহাসকে যখন এভাবে তুলে ধরা হয়, যখন ধর্মকে উপস্থাপন করা হয় যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ও নিম্নশ্রেণির হিসেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের ভিতে আঘাত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের আগে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় অনেক চিন্তাবিদ ও লেখক একটি কথা ব্যবহার করতে শুরু করে, Age of Reason। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল অজ্ঞতা ও অন্ধকারের কাল থেকে বের হয়ে তারা প্রবেশ করেছেন যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার আলোয় আলোকিত এক নতুন সময়ে।

কিন্তু বাস্তবতা এতটা গ্ল্যামারাস না। পশ্চিমে তৈরি হওয়া বিশ্বাসের সংকটের কারণ ছিল ক্যাথলিক চার্চের ওপরতলার লোকেদের আদর্শিক দেউলিয়াত্ব। একের পর এক দুর্নীতিপরায়ণ পোপ, তাদের অসুস্থ বিলাসিতা, অনৈতিকতা, চার্চের মাধ্যমে টাকা নিয়ে 'গুনাহ মাফ করা', রক্ষিতার গর্ভে জন্ম নেয়া জারজ সন্তানদের প্রকাশ্যে বৈধতা দেয়ার মতো বিভিন্ন ঘটনা জন্ম দেয় এক চরম সংকটের, যাকে অনেকে ইউরোপের ইতিহাসে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে থাকেন। এ সংকটের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রোটেস্ট্যান্ট ধারা।

নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রোটেস্ট্যান্টরা আবার বিভক্ত হয়ে

পড়ে নানা দল-উপদলে। এ দলগুলো একইসাথে নিজেদের মধ্যে এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। ক্রিশ্চিয়ানিটির নামে চলা এদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ধ্বংস, যুলুম, অবিচার ইত্যাদির কারণে ইউরোপিয়ানদের মনে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। এমনকি ধর্মীয় নেতারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এমন কিছু মৌলিক নীতি প্রয়োজন যেগুলোর ব্যাপারে সমাজের সবাই একমত হবে। ইউরোপের সেক্যুলার চিন্তার উত্থানের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল এই নীতি–ধর্মীয় মূলনীতির বদলে সমাজ তৈরি হবে যুক্তি ও বাস্তবিক জ্ঞানের মাধ্যমে।

ধর্মকে ত্যাগ করার ফলে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ইউরোপীয় সমাজের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যেগুলোর উত্তর আগে ধর্ম থেকে নেয়া হতো। আর এ উত্তরগুলো খোঁজার প্রচেষ্টা হিসেবে জন্ম নেয় পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞান। ধর্ম যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় সেগুলোর বিকল্প উত্তর দেয়াই যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ, তাই ধর্মের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না। তাই শুধু বাইরের চেহারা দেখেই পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে গ্রহণ করা সম্ভব না, আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হওয়াই জ্ঞানের ইসলামীকরণ প্রকল্পের অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণ।

এ কথাগুলো হয়তো খুব বেশি তাত্ত্বিক কথার কচকচি মনে হতে পারে তবে স্রষ্টাকে সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সেক্যুলার চিন্তা খোঁজার চেষ্টা করে, সেগুলোর দিকে তাকালেই সেক্যুলারিযম এবং পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেক্যুলার চিন্তা ৫টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে :

> ১) মহাবিশ্বের সূচনা কীভাবে হলো?
>
> ২) মানুষ কোথা থেকে, কীভাবে এল?
>
> ৩) পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? নৈতিকতার ভিত্তি কী?
>
> ৪) সমাজব্যবস্থাকে কীভাবে সাজানো উচিত?
>
> ৫) জ্ঞানের প্রকৃতি কী? কোন ধারণা বৈধ (valid) আর কোন ধারণা অবৈধ (invalid) সেটা আমরা কীভাবে বুঝব?

এসব প্রশ্নের উত্তরের বেলায় ইসলাম ও ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। কিন্তু সেক্যুলারিযমের দেয়া উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। স্রষ্টা ও ধর্মকে বাদ দিয়ে এ মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার যে চেষ্টা, তারই নাম সামাজিক বিজ্ঞান। যেহেতু সেক্যুলারিযমের উত্তর সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই যৌক্তিকভাবেই আমাদের পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর প্রথম ধাপ যেহেতু স্রষ্টাকে অস্বীকার করে মানবজীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা, তাই এ শেকড়ের ওপর গজিয়ে ওঠা পশ্চিমা জ্ঞানের ইসলামী বনসাই বানানো সম্ভব না। এ কারণে পশ্চিমা জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোটখাটো ও অমৌলিক কিছু পরিবর্তন এনে সেগুলোকে ইসলামী রূপ দেয়ার চেষ্টা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছে। এ নিষ্ফল ও ক্ষতিকর চেষ্টার বদলে ইবনু খালদুনসহ আমাদের অন্যান্য পূর্বপুরুষদের গড়ে তোলা ভিত্তির ওপর কাজ করার দিকে আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত, যেখানে প্রয়োজনমতো পশ্চিমা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে কাজে লাগানো যাবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধর্মের বদলে সেক্যুলার চিন্তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে ইউরোপীয়রা ৫টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর নতুন করে খুঁজতে বাধ্য হয়। আধুনিক পশ্চিমা অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বগুলোর ওপর এ উত্তরগুলোর প্রভাব ব্যাপক। যেহেতু এ

সামাজিক বিজ্ঞানগুলো গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও গ্বাইবকে অস্বীকারের মাধ্যমে, তাই বর্তমানে যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে সেভাবে এসব সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ সম্ভব না। বর্তমানে এ সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মূল ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে গ্রহণ করে চেষ্টা করা হচ্ছে সেগুলোর ইসলামী রূপ দেয়ার। এ এক অসম্ভব কাজ। বরং আমরা যদি আসলেই এ কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের শুরু করতে হবে আমাদের নিজস্ব ইসলামী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে।

* * *

[1] ড. আসাদ যামানের *The Origin of Western Social Sciences* অবলম্বনে।